সমকাল

তারিখ ০৫ NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?

ফিরোজ চৌধুরী

আজ থেকে আট বছর আগে বদলে গিয়েছিল বাংলাদেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা। মহাসমারোহে এবং এক বুক আশা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি। ভাবা গিয়েছিল, এলোমেলো শিক্ষাকে অতঃপর প্রকৃত বাহনের ওপর তুলে দেওয়া গেছে। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই বিপুল বিস্ময়ে লক্ষ্য করা গেল, ওই প্রকৃত বাহনখানা রূপ নিয়েছে উদ্ভট উটে এবং অদ্যাবধি সেই 'উদ্ভট উটের পিঠেই চলেছে' আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা।

দোষটা শিক্ষাব্যবস্থার নয়, দোষটা আমাদেরই। আমরাই এই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিকে (সৃজনশীল শিক্ষা) ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেছি একদম খাদের কিনারে। একটি জাতি কতটা দক্ষ, মেধাবী এবং সৃজনশীল হলে 'সৃজনশীল গাইড বই' প্রণয়ন করতে পারে, তা বাঙালিকে না দেখলে বোঝা সম্ভব নয়। একটি জাতি কতটা শিক্ষানুরাগী হলে পাড়া-মহল্লায়, হাটে-বাজারে, নগরে-গঞ্জে, মোড়ে মোড়ে কোচিং সেন্টার গড়ে তুলতে পারে, তা বাংলাদেশে জন্ম না নিলে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একটি জাতি কতটা আত্মঘাতী হলে পরীক্ষার আগের রাতে নিজ সন্তানের জন্য ফাঁস হওয়া প্রশ্ন কিনতে পারেন, তা বাঙালি অভিভাবককে না দেখলে জানা সম্ভব নয়। এ তালিকা আরও দীর্ঘ করা সম্ভব।

একটি দেশ কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপরিণামদর্শী হলে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর জন্য হাতে নেওয়া এসইএসডিপি প্রকল্পের ৮০০ কোটি টাকা জলে ফেলতে পারে, তা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) প্রতিবেদন প্রকাশিত না হলে জানা সম্ভব হতো না। দৈনিক সমকালে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদন বলছে, আট বছর আগে সৃজনশীল পাঠদানের মানোন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও সরকারের অর্থায়নে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার এ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। তারপর শুধুই সময় গড়িয়েছে কিন্তু কোনো ফল মেলেনি। সৃজনশীলের অবস্থা দিন দিন বেহাল থেকে বেহালতর হয়েছে। সৃজনশীল ব্যবস্থা নিয়ে এর আগেও একই ধরনের প্রতিবেদন দিয়েছে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন কমিটি ও বিভিন্ন বেসরকারি

প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ালেই কি সমস্যার সমাধান মিলবে? সমাধানের জন্য আমাদের সবার আগে স্বীকার করে নিতে হবে, বাংলাদেশে সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা তার পথ হারিয়েছে। কিন্তু তাকে উদ্দেশ্য করে 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' এমন প্রশ্ন করার মতো কেউ নেই। যদি থাকত, তবে দীর্ঘ আট বছরে কর্তাব্যক্তিদের কেউ না কেউ প্রশ্ন তুলতেন এবং সমস্যাগুলো শনাক্ত করতেন। সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালুর আগে কেবল কয়েকজন শিক্ষককে ডেকে নিয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাত্র তিন দিনে কয়েক ঘণ্টার ক্লাসে কী করে একজন শিক্ষক নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে যাবেন? এ শিক্ষকরা আবার এলাকায় গিয়ে অন্যদের শিখিয়েছেন। এতেই বোঝা যায়, প্রশিক্ষণের নামে কী হয়েছে। তারা

মূলত কিছুই শেখেননি। এমনকি প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পর্যন্ত শেখেননি। তাই বেশিরভাগ শিক্ষক গাইডবই থেকে সরাসরি সৃজনশীল প্রশ্ন তুলে দেন। আবার দেশের কোথাও কোথাও শিক্ষক সমিতির তৈরি করা প্রশ্নপত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা বা জেলার সব স্কুলে পরীক্ষা নিতে বাধ্য করা হয়। এতে উপজেলার সব শিক্ষক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেন। সমিতির প্রশ্ন বিকিকিনির পেছনে বিশাল অঙ্কের বাণিজ্য রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বছরের পর বছর এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষকরা সৃজনশীল প্রশ্ন করায় দক্ষতা অর্জন করবেন কীভাবে? আর শিক্ষকরাই দক্ষ না হলে শিক্ষার্থীরা কীভাবে তা আয়ত্ত করবে? ফলে শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করছে ভিন্ন উপায়ে। সে উপায় কোচিং ও গাইডবই। শিক্ষার্থীদের মতে, শিক্ষকরা তাদের প্রাইভেট পড়তে উৎসাহিত করেন। বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়,

গাইডবুকে ম্লান সৃজনশীলতা

রাহনুমা দিশা

আমাদের দেশে নানা সময়েই পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে। সর্বশেষ নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, সেটি মূলত পশ্চিমের স্ট্রাকচার্ড কোশ্চেন পদ্ধতি থেকে নেওয়া। এ পদ্ধতির উদ্ভব বেঞ্জামিন স্যামুয়েল ব্লুমের 'ব্লুমস টেক্সোনমি' থেকে। তিনি শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। গোড়ায় এর বাংলা অর্থ করা হয়েছিল, 'কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন'। পরে সম্ভবত শ্রুতিমধুর করার জন্য একে 'সৃজনশীল' নাম দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্য ছিল, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য দূর করা এবং শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার প্রবণতা দূর করে

বুদ্ধিবৃত্তিক পাঠে নিয়োজিত করা। তবে চালু করার সময় থেকেই এ নিয়ে নানা মহলে মতভিন্নতা ছিল। বিভিন্ন পর্যায় মিলিয়ে প্রায় এক দশক পার হওয়ার পর এই পরীক্ষা পদ্ধতি নতুন করে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। এর কারণ মূলত শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানের নিম্নগামিতা। নানা মহলে বরাবর অসন্তোষ থাকলেও এটি প্রকটভাবে ধরা পড়ে গত কয়েক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল থেকে। পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত করার পরও তাহলে কোথায় গলদ?

প্রথমত, পদ্ধতির প্রয়োগ– নতুন কোনো পদ্ধতি চালু করার আগে শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রস্তুতির প্রয়োজন। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, উপর্যুপরি সেমিনারসহ নানা ধরনের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে পুরো ব্যবস্থাপনাকে প্রস্তুত করার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, তা একেবারেই পূরণ হয়নি। বরং যেনতেনভাবে নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করে দিয়ে তারপর ধারাবাহিকভাবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবস্থাটি এতই ধীরগতির যে, আট বছর পার করেও সব শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব

মাত্রা পেয়েছে। 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (এসইএসডিপি) নিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমডি) বিভাগের প্রতিবেদন সম্পর্কে সম্প্রতি দৈনিক সমকাল প্রতিবেদন করেছে। প্রতিবেদনে প্রকল্পের ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, 'সৃজনশীল' পদ্ধতির প্রশ্ন সব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি-না সেটি যথেষ্ট পর্যালোচনা না করেই নির্বিশেষে প্রয়োগ করা হচ্ছে (ইংরেজি বাদে)। যেমন– বাংলা, ইতিহাস কিংবা গণিতে এ পদ্ধতির প্রশ্ন কতটা কার্যকর, তা নিয়ে ভাবার ছিল। গণিত বিষয়টিতে কিছুটা ছকবদ্ধতা আছে এবং তা শিক্ষার্থীদের অনুশীলন দাবি করে। মুখস্থ করার ব্যাপারটি গণিতে তেমন একটা প্রযোজ্য নয়। আবার গণিতে জ্যামিতিক প্রমাণ একটি মৌলিক পাঠ, এটি অভ্যাস না করলে ভবিষ্যতে গণিত তো বটেই, এমনকি পদার্থবিদ্যা পড়তে গিয়েও হোঁচট খেতে হবে। কেবল প্রায়োগিক চর্চা গণিতের মূল সাধনাকে ব্যাহত করবে। আবার বাংলা সাহিত্য বিষয়ের প্রশ্নের ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধতা শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এখানে দেখা যায় কেবলই একটি কবিতা বা গদ্যের সঙ্গে অন্য কোনো টেক্সটের তুলনা করতে বলা হয়। এটি সবসময় শিক্ষার্থীকে সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ করে না। আবার ইতিহাসের ক্ষেত্রে 'প্রয়োগ' এবং 'উচ্চতর' দক্ষতা কিছুই বোঝায় না। ফলে সব বিষয়কে একই নির্দিষ্ট ছকে না ফেলে আলাদা করে পর্যালোচনা করা উচিত ছিল।

বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় কিংবা সমাজবিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতির মতো বিষয়ে 'সৃজনশীল' প্রশ্ন কার্যকরী। এ বিষয়গুলোতে ব্যর্থতার কারণ, প্রশিক্ষণের অভাব এবং সামগ্রিক অব্যবস্থাপনার প্রভাব। তবু এখানে একটা সাফল্যের কথা বলতেই হয়, নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধ করা গেছে। আবার অন্যদিকে প্রশ্ন ফাঁস, কখনও কখনও পরীক্ষা কেন্দ্র এবং নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশে পরীক্ষায় অন্যান্য অসদুপায় বিশেষত পরীক্ষা হলে যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এ সবই শিক্ষা সেক্টরে চরম অব্যবস্থাপনার ফল।

তৃতীয়ত, কেবল পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে কখনোই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নের প্রত্যাশা করা অর্থহীন। পরীক্ষা পদ্ধতি একটি উপাদান মাত্র। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে– যেমন কারিকুলাম প্রণয়ন, মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষকের মান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত সক্ষমতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সঠিক অনুপাত এসব বিষয় নিশ্চিত করা না গেলে পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। বরং অনৈতিকতার চর্চায় নেতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। নতুন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রশ্ন ফাঁস যে ভূমিকাটি রেখেছে। বস্তুত, শিক্ষা ক্ষেত্রে সত্যিকার মানোন্নয়ন করতে হলে সাময়িক বৈদেশিক সাহায্য বা প্রকল্পের ওপর কোনোভাবেই নির্ভর করা যাবে না। নিজেদের রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিবর্তন এনে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। অল্প পুঁজিতে বাম্পার ফলনের আশা ত্যাগ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষক অসন্তোষ দূর করা, শিক্ষক